কন্যা শিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ

সেলিনা আক্তার

আজকের কন্যা-শিশুর মাঝেই সুপ্তভাবে বিরাজ করছে আগামী দিনের আদর্শ মা। যেকোনো কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য নারী পুরুষের অবদান অনস্বীকার্য। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে কন্যা শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বরকে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। গৃহ-পরিবেশে একজন পুত্রসন্তানকে যেভাবে গুরুত্ব সহকারে আদর-যত্নে লালনপালন, শিক্ষার প্রতি যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেভাবেই একজন কন্যা-শিশুর মানসিক নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করার কথাই উচ্চারিত হয়ে থাকে এ দিবসে। সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রসহ সমস্ত স্থানে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ দূরীকরণ হলেও কন্যা-শিশু দিবস অন্যতম উদ্দেশ্য থাকলেও এ বছর থেকে ০৮ অক্টোবর দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় কন্যা শিশু দিবসের এবারে প্রতিপাদ্য হলো আমি কন্যা শিশু স্বপ্নে গড়ি সাহসে লড়ি দেশের কল্যাণে কাজ করি। উল্লেখ যে এবারের কন্যা শিশু দিবস ৩০ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ৮ অক্টোবর পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান নারী অধিকারের যুগে, সুশাসনের ও মানবাধিকারের যুগে কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা আগের তুলনায় অনেক কমলেও তা যে একেবারে নেই, তা বলা যাবে না। এ ধরনের মানসিকতা এখনো আমাদের সমাজ থেকে পুরোপুরি দূর হয়নি। ক্ষেত্র বিশেষে কন্যা সন্তানের প্রতি আগ্রহ বাড়লেও সামাজিকভাবে কন্যা সন্তানের অভিভাবকরা কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে থাকেন। বিশ্বজুড়ে নারী ও কন্যা-শিশুদের প্রতি সহিংসতা ও নৃশংসতার ঘটনা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ শিশু, যাদের বয়স আঠারো বছরের কম। আর শিশুদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ কন্যা-শিশু যাদের পিছনে রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কন্যা-জায়া-জননীর বাইরেও কন্যা-শিশুর বৃহৎ জগত রয়েছে। স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করা ছাড়াও পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন করা সম্ভব। এজন্য কন্যা-শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ বেড়ে ওঠার সব অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানতম অন্তরায় এবং আমাদের সমাজ কন্যা শিশুদেরকে বোঝা মনে করে। কন্যা শিশুদের পড়াশোনার পেছনে টাকা খরচ করতে চায় না। তারা মনে করে বিয়ে দিতে পারলে বোঝা দূর হয়ে গেল। তবে সময় অনেক বদলেছে। কন্যা শিশুরা এখন আর বোঝা নয়। বরং কন্যা শিশুরা হলো সর্বোত্তম বিনিয়োগ ও সমাজের আলোকবর্তিকা। জাতিসংঘের শিশু-বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষ স্থানীয় দেশগুলোর একটি। বাংলাদেশে ১৮ শতাংশ মেয়ের ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে ৫২ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়। সেভ দ্য চিলড্রেনের তথ্য অনুসারে, ১০ বছর বয়সি কন্যা শিশুদের অনেক বেশি বয়সি পুরুষদের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্ত, গরিব নির্বিশেষে আমাদের সমাজে এমনকি নিজের পরিবারেও লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মেয়ে শিশুর প্রতি অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক আচরণ। ফলে অনেকাংশেই দরিদ্রতার প্রথম শিকার হয় কন্যা শিশুরা। কিছু সামাজিক কথিত নীতির কারণে শিশুকাল থেকেই কন্যা শিশুদের এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যাতে করে তারা প্রতিবাদী হতে না শেখে। তাদের প্রতি করা বৈষম্যমূলক আচরণকে অন্যায় হিসেবে না দেখে বরং সহজাত ও সমঝোতার সঙ্গে গ্রহণ করতে শেখানো হয়। যা পরবর্তী সময়ে নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার পথটিকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করে।

শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা কন্যা শিশুর উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্ল্যান বাংলাদেশের এক যৌথ জরিপ মতে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করা ২৬ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের আগে। নিরক্ষর নারীদের বেলায় এই সংখ্যা ৮৬ শতাংশ। সরকার বিগত বছরগুলোতে ছাত্রী ও নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য নারীবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলসমূহে ছাত্রী অনুপ্রবেশ এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে।

কন্যা-শিশু সুরক্ষা পেলে সব বৈষম্য দূর হবে। কন্যা-শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করেছে। বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে নেওয়া হয়েছে কঠোর আইন। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। অভিভাবকদের সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হতে হবে কন্যা-শিশুদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কন্যা-শিশুর অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে পুরুষকে। আর আমাদের দেশে আগে কোনো পরিবারে কন্যা সন্তান হলে খুশি না হওয়ার একটা ব্যাপার ছিল সেটা আগের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। আগের মতো এখন আর সেই আক্রোশগুলো নেই যেটা আগে কন্যা সন্তান হলে দেখা যেতো। তবে এখন দেখা যাচ্ছে একটা কন্যা সন্তান হলে বাবা মা যতটা খুশি হয়, তো পরবর্তীতে তারা বড়ো হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক প্রেক্ষাপটে তারা অনেক বেশি কোণঠাসা হয়। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়, নির্যাতনের শিকার হয় ও অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তো সেইদিক থেকে এখনো কন্যা-শিশুরা পিছিয়ে আছে। আমাদের সমাজে এখনও কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করা হয়। আর আমাদের দেশের শিশুকন্যা সন্তানরা একেবারেই নিরাপদে নেই।

শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত হয় শিশু আইন-১৯৭৪ যা যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে শিশু আইন-২০১১ রূপে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯-এ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এরপরেও শিশুর প্রতি বৈষম্য আর অধিকারের বিষয়টি আমরা ভুলে যাই। শিশু নীতি অনুসারে শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সি সকল ব্যাক্তিকে বুঝায়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভিষ্ট : ০৫ এ লিঙ্গ সমতা অবস্থান করছে। অর্থাৎ সমতার ব্যাপারটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। মেয়েদের পুষ্টির চাহিদা, শিক্ষার অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা, বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসা, বলপূর্বক বাল্যবিবাহ, ধর্ষণসহ যেসব ঘৃণিত কাজকর্ম রয়েছে সেগুলোর নির্মূল করা ছাড়া উপয়ান্তর নেই। কন্যাশিশুদের সার্বিক উন্নতির জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ গণমাধ্যম কাজ করে যাচ্ছে, এসব কাজকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় বাজেটের ২ শতাংশ শিশুদের জন্য বরাদ্দ রাখেন যা কন্যা ও পুত্র সকল শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। তবে সমতা বিধানের লক্ষ্যে সরকার কন্যা শিশুদের জন্য নিয়মিত স্কুল, নিরাপত্তা, স্যানিটারি ব্যবস্থা, খেলাধূলার সুযোগ, হেল্পলাইন, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, মাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাসহ নানা ধরণের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। তবুও পরিতাপের বিষয় এই যে এখনো কন্যা শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হলে তারা বিষয়টি চেপে রাখে সমাজে লোকলজ্জার ভয়ে। খুবই পীড়াদায়ক হলেও এটাই সত্য আমাদের সমাজে কেউ ধর্ষিত হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্ষিতার ছবি ভাইরাল হয়ে যায়, ফলে সেই ধর্ষিত নারীর জীবন আরও দুর্বিসহ হয়ে যায়। যদিও এখন এই বিষয়ে কিছুটা সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো কাজে গভীর রাতে একই বয়সি একটি ছেলে ও মেয়ে যদি রাস্তায় থাকে তখন ছেলেটির ভয় থাকে তার হাতে থাকা মোবাইল ফোন, টাকা-পয়সা ইত্যাদি হারানোর ভয়। বিপরীত দিকে মেয়েটির থাকে সম্ভ্রম হারানোর ভয়। মেয়েদের এই ভয় শিশুকাল থেকে শুরু করে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত থেকে যায়। এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে না বেরুতে পারলে সামগ্রিক উন্নতি অসম্ভব।

অনেক কন্যাশিশু বাবার বাড়িতে ঠিকমতো খাবারও পায় না। পরিবারে খাবারে টান পড়লে সেই টানটা কন্যার উপরই বর্তায়। ঠিক তেমনি বিয়ের পরও প্রয়োজনীয় খাবার পায় না। সুষম খাবার তো অকল্পনীয় বিষয়। ফলে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে অপুষ্টির শিকার হওয়া কন্যাশিশুরা শারীরিক সমস্যায় ভোগে। জন্ম দেয় অপুষ্ট শিশু, রোগাক্রান্ত শিশু।আর নিজের পরিবারে যেমন, স্বামীর পরিবারেও অবদমনের শিকার তারা। ফলে তাদের মানসিক সমস্যাও আশঙ্কাজনক। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় এক কোটি মেয়ে বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের প্রায় অর্ধেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট নাই।অথচ বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতির জন্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। নির্যাতনের শিকার মেয়েদের মধ্যে দেখা গেছে, ৭২শতাংশ যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। অপরদিকে নির্যাতনের শিকার ছেলেদের মধ্যে ৬৬শতাংশ প্রধানত জোরপূর্বক শ্রমের শিকার হয়। অনেক কন্যা শিশু শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।সারা বিশ্বে মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণ, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং নির্যাতন বা সহিংসতামুক্ত জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। প্রতিবন্ধী মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের সহায়তা এবং পরিসেবাগুলো পেতে অতিরিক্ত বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে।আর জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে মেয়েদের অধিকারসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সকলের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক উন্নতি সাধন করেছে।

আজকের কন্যা শিশুই আগামীর পরিপূর্ণ নাগরিক তাই তাদের বেড়ে ওঠা ও বিকাশের প্রতিটি ধাপেই সমান গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য। প্রথমত কন্যা শিশুদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং অন্যদেরও সচেতন করতে হবে। অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দক্ষতা অর্জন, সুযোগের সঠিক ব্যবহার এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সোচ্চার হয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করতে শেখা—এসবই তাদের এগিয়ে যাওয়ার মূল শক্তি। পরিবারের ভূমিকাও এখানে সবচেয়ে বড়। মা–বাবা ও অভিভাবকদের উচিত কন্যা শিশুর প্রয়োজনগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা, বোঝা এবং যে কোনো প্রয়োজনে পাশে থাকা। তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই মেয়েদের মতামত শুনতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে। ঘরে-বাইরে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে কারণ ছেলে ও মেয়ের অধিকার এক ও অভিন্ন। শিক্ষা গ্রহণ থেকে মত প্রকাশ সবক্ষেত্রেই সমান সুযোগ দেওয়ার দায়িত্ব পরিবারকেই নিতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। কন্যা শিশুকে সব ধরনের নির্যাতন ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশ ও সম্ভাবনা উন্মোচনে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং সব ক্ষেত্রে মেয়েদের সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা জরুরি। উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কন্যা শিশুকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার বিকল্প নেই। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত উদ্যোগেই কন্যা শিশুরা হয়ে উঠবে আগামী আত্মবিশ্বাসী নাগরিক।

#

লেখক: সহকারি তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার